বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু
Physiography and Climate of Bangladesh

ইউনিট ৪

ভূমিকা : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভূ-রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের তিনদিকে ভারত ও মিয়ানমার এবং দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এদেশে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু মানুষের জীবনধারাকে বহুভাবে প্রভাবিত করে। এদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যতার পাশাপাশি এদেশের জলবায়ুও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতু দেখা যায়। এগুলো হলো-উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল এবং শুষ্ক ও শীতল শীতকাল। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি কারণে এদেশ প্রায় প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এসব দুর্যোগ এখানকার জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে যা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এই ইউনিটে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা, ভূ-প্রকৃতি, ভূমি ব্যবহার, জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা
পাঠ-৪.২ : ভূ-প্রকৃতি
পাঠ-৪.৩ : ভূমি ব্যবহার
পাঠ-৪.৪ : বাংলাদেশের জলবায়ু
পাঠ-৪.৫ : প্রাকৃতিক দুর্যোগ

পাঠ-৪.১ ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা
Geographical Location and Boundary

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- সীমানা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা।

ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের দক্ষিণ এশিয়া অংশে এদেশের অবস্থান (চিত্র-৪.১.১)। বাংলাদেশ ২০°৩৪ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের প্রায় মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫) অতিক্রম করেছে। যা এদেশকে ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এদেশের অবস্থান বহির্বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃতি ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃতি প্রায় ৭৬০ কিলোমিটার। দেশের দক্ষিণে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রসার ঘটলে অর্থাৎ ভূ-ভাগ জেগে উঠলে ভবিষ্যতে আয়তন আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

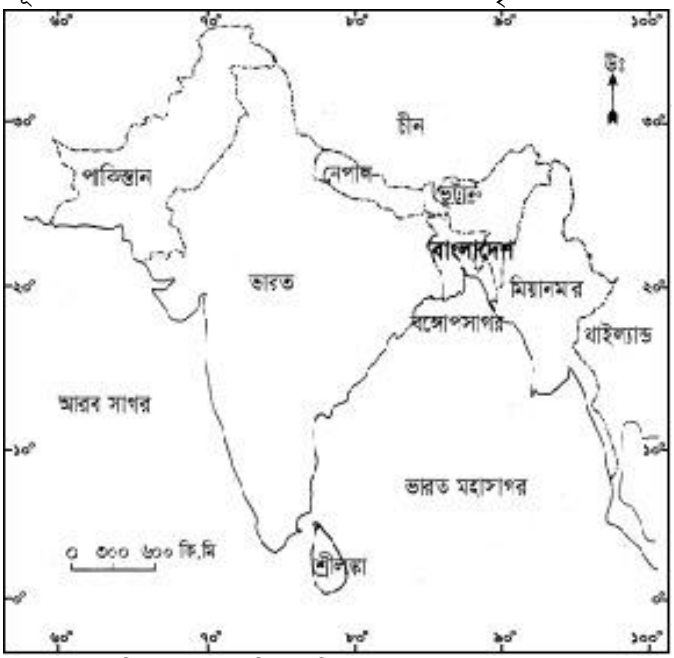

চিত্র ৪.১.১ : দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান

সীমানা (Boundary) : বাংলাদেশের তিনদিকের স্থলভাগ ভারত এবং মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে অবস্থিত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। এ দেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিয়ানমার অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা ৪,৭১২ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সাথে সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সাথে ২৮১ কিলোমিটার। দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২২ কিলোমিটার এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪০ কিলোমিটার (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ছকে বাংলাদেশের তথ্যগুলো পূরণ করুন।

আয়তন	চতুর্দিকের সীমানা	ভারত, মিয়ানমার ও বঙ্গোপসাগরের সাথে সীমারেখার দৈর্ঘ্য

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। তিনদিকের স্থলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা ৪,৭১২ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩,৭১৫ কিলোমিটার, মিয়ানমার ২৮১ কিলোমিটার এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা ৭১৬ কিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এদেশ বহির্বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত?
(ক) এশিয়া (খ) ইউরোপ
(গ) আফ্রিকা (ঘ) উত্তর আমেরিকা

২। বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত বেষ্টিত দেশ হলো-
i. ভারত ii. নেপাল
iii. মিয়ানমার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। বাংলাদেশের আয়তন কত?
(ক) ১,৩৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (খ) ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার
(গ) ১,৫৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (ঘ) ১,৬৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার

৪। বাংলাদেশের মাঝ বরাবর কোন রেখা অতিক্রম করেছে?
(ক) মকরক্রান্তি রেখা (খ) নিরক্ষরেখা
(গ) মূল মধ্যরেখা (ঘ) কর্কটক্রান্তি রেখা

৫। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশের বিস্তৃতি কত কিলোমিটার?
(ক) ৪৪০ কিলোমিটার (খ) ৪৬০ কিলোমিটার
(গ) ৪৮০ কিলোমিটার (ঘ) ৫০০ কিলোমিটার

পাঠ-৪.২ ভূ-প্রকৃতি
Physiography

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির শ্রেণিবিভাগ জানতে পারবেন;
- টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহের অবস্থান বলতে পারবেন এবং
- সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূ-প্রকৃতি, টারশিয়ারি, প্লাইস্টোসিনকাল, প্লাবন সমভূমি ।

ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এ দেশের বৃহৎ নদীসমূহ পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করে একযোগে সুবিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি অংশ ব্যতীত সমগ্র দেশ নদীবেষ্টিত পলল দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে বিস্তৃত।

ভূ-গাঠনিক অবস্থা এবং গঠন সময় অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নের ছকে ভূ-প্রকৃতির প্রকারভেদ দেখানো হলো-

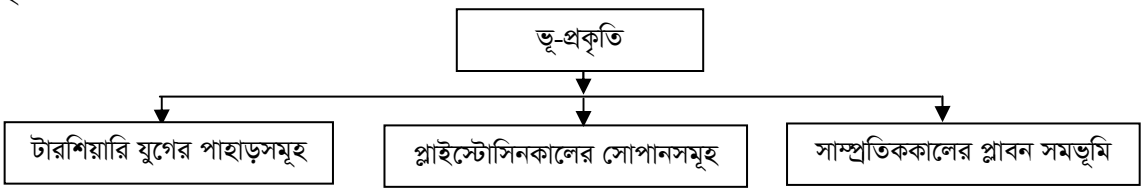

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় যে সকল পর্বতের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় হিসেবে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বের সময়কে টারশিয়ারি যুগ বলা হয়। এ পাহাড়সমূহ বেলেপাথর, শেল ও কদর্ম দ্বারা গঠিত। রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়সমূহ টারশিয়ারি যুগের অন্তর্ভুক্ত। এ পাহাড়সমূহ আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধারণা করা হয়। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ৬১০ মিটার। পাহাড়সমূহের বৈশিষ্ট্য হলো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাঁজযুক্ত এ পাহাড়সমূহ উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কৃত বান্দরবান জেলায় অবস্থিত তাজিং ডং (বিজয়) পর্বতশৃঙ্গটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ছিল বান্দরবান জেলার কিওক্রাডং, যার উচ্চতা ১,২৩০ মিটার। এ অঞ্চলের পাহাড়ের মাঝে মাঝে অসংখ্য সংকীর্ণ উপত্যকা রয়েছে। যেখান দিয়ে পার্বত্য নদীগুলো প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। পার্বত্য এসব নদীর মধ্যে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, কাসালং, নাফ অন্যতম। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এসব পাহাড় কৃষিকাজের উপযোগী নয়। তবে স্থানীয় অধিবাসীগণ পাহাড়ের ঢালে জুম পদ্ধতিতে সীমিত পরিসরে চাষাবাদ করে থাকে। কয়েক বছর চাষাবাদের পর আবার অন্যস্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করে একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে।

খ. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলের পাহাড়সমূহের গড় উচ্চতা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতার তুলনায় কম। উত্তর-পূর্বঞ্চলের পাহাড়সমূহের গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। তবে উত্তরের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার এবং এগুলোকে স্থানীয়ভাবে টিলা বলে। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক শহরের উত্তরে প্রায় ৪০ কি.মি এলাকা জুড়ে একটি টিলা পাহাড় রয়েছে যা 'ছাতক পাহাড়' নামে পরিচিত। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণে অবস্থিত পাহাড়গুলোর ঢাল বেশ খাড়া এবং উপরিভাগ অসমান। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হওয়ায় পাহাড়ের ঢালে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান এ অঞ্চলে অবস্থিত।

২. প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ : আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে ও ধূসর হওয়ায় অন্যান্য অঞ্চলের মাটি হতে সহজেই পৃথক করা যায়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এর অন্তর্ভুক্ত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান বা উচ্চভূমি গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিম্নে প্লাইস্টোসিনকালের এসব সোপান বর্ণনা করা হলো।

ক. বরেন্দ্রভূমি : রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট এবং রংপুর বিভাগের রংপুর, গাইবান্ধা ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। এটি বঙ্গ অববাহিকায়

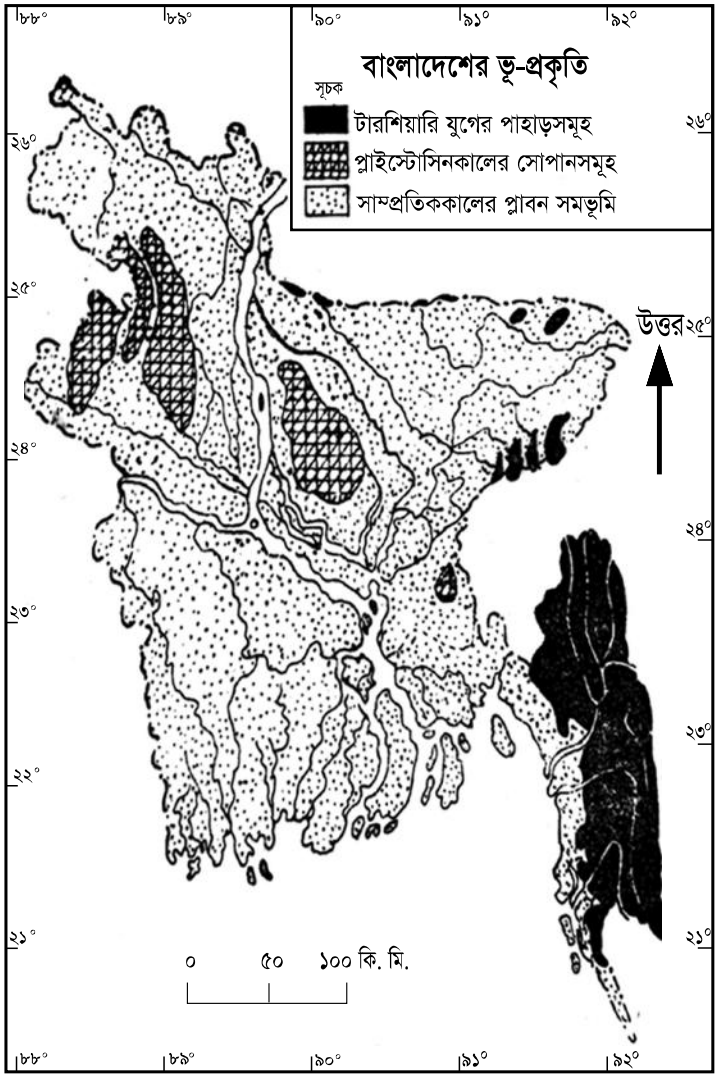

চিত্র-৪.১.১: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

প্লাইস্টোসিনকালের সর্ববৃহৎ উচ্চভূমি। প্লাবন সমভূমি থেকে বরেন্দ্রভূমির গড় উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা অসমতল। বর্তমানে বরেন্দ্র বহুমুখী সেচ প্রকল্প এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ উচ্চভূমি কৃষিকাজের জন্য বিশেষ উপযোগী করা হয়েছে। ধান এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল। এছাড়া পাট, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

খ. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হতে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত এ উচ্চভূমি বিস্তৃত। এ অঞ্চলটি টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় নিয়ে গঠিত। এর আয়তন ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। এটি প্লাইস্টোসিনকালের দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চভূমি। এখানকার মাটি লালচে এবং কংকরময় বলে কৃষিকাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়। তবে প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপন্ন হয়। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ এ উচ্চভূমি গজারী বৃক্ষের কেন্দ্র। এজন্য এটি গজারী বৃক্ষের বনভূমি হিসেবেও পরিচিত।

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি বাংলাদেশকে একটি উর্বর কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করেছে । কেননা, টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ পলি দ্বারা গঠিত বিস্তীর্ণ সমভূমি। এ প্লাবন সমভূমির বয়স ১২,০০০ বছরের কম। পদ্মা, মেঘনা, যমুনাসহ অসংখ্যা ছোট-বড় নদী সারা দেশে জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। এসব নদী সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর বন্যার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এভাবে বন্যার সঙ্গে বাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে দেশের বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। এ প্লাবন সমভূমি উত্তর দিক থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র সমতলে মিশেছে। দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার, নারায়নগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার। এ অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জলাভূমি ও নিম্নভূমি। স্থানীয়ভাবে এসব জলাভূমি ও নিম্নভূমিকে বিল, ঝিল বা হাওড় বলে। রাজশাহীর চলনবিল, ঢাকার আড়িয়াল বিল, গোপালগঞ্জের বিল এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার বিল ও হাওড় অন্যতম। মেঘনা নদীর মোহনায় রয়েছে হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে আরোও কিছু ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। এসব দ্বীপের মাটি উর্বর এবং মানব বসতির উপযোগী।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. হিমালয় পর্বত হতে বাহিত পলল দ্বারা গঠিত রংপুর ও দিনাজপুরের পাদদেশীয় সমভূমি।

খ. ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার বন্যাপ্রবণ সমভূমি।

গ. খুলনা, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি। এ অঞ্চলের নদীতে প্লাবন কম হয়, তবে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়।

ঘ. নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি। এখানকার পতেঙ্গা সৈকত, কক্সবাজার সৈকত এবং টেকনাফ সৈকত পর্যটনের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ঙ. ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা এবং ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব-দ্বীপ সমভূমি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে পাহাড়, উচ্চভূমি বা সোপানসমূহ এবং বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি। যা এখানকার কৃষি, মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ব্যাপক বিস্তার করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ভূ-প্রকৃতিগুলোর তিনটি করে বৈশিষ্ট্য লিখুন।

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়	প্লাইস্টোসিনকালের সোপান	সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এদেশের ভূ-প্রকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ভূ-গাঠনিক অবস্থান এবং গঠন সময়ের উপর ভিত্তি করে ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড় নামে পরিচিত। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ ও প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি দ্বারা গঠিত। নদী বিধৌত প্লাবন সমভূমি কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত উর্বর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

২। টারশিয়ারি যুগের পাহাড় রয়েছে কোন জেলায়?
i. দিনাজপুর ii. খাগড়াছড়ি
iii. রাঙামাটি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। তাজিং ডং (বিজয়) এর উচ্চতা কত?
(ক) ১,১৩১ মিটার (খ) ১,২৩১ মিটার
(গ) ১,৩৩১ মিটার (ঘ) ১,৪৩১ মিটার

৪। মধুপুর গড় অবস্থিত-
i. ময়মনসিংহ ii. খাগড়াছড়ি
iii. টাঙ্গাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শাম্মীর গ্রামের বাড়ি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি জেলায়। অনুকূল ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সেখানে প্রচুর চা বাগান গড়ে উঠেছে। যা এই এলাকাকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলটি কোন ধরনের ভূ-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত?
(ক) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ের (খ) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানের
(গ) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির (ঘ) কোনটিই নয়

৬। আলোচ্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়
ii. সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিং ডং
iii. উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ ভূমি ব্যবহার
Land Use

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ভূমি ব্যবহার বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- গ্রামীণ ও নগর ভূমি ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূমি, গ্রামীণ, নগর।

ভূমি ব্যবহার

সাধারণভাবে ভূমি ব্যবহার বলতে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভূমির যে কোনো ব্যবহারকে বুঝায়। অর্থাৎ ভূমি ব্যবহার শব্দদ্বয় দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের বিশেষ কোনো এলাকার জমিগুলো প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়। ভূমি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতির এই সম্পদকে কেন্দ্র করেই মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। আমাদের দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় ভূমির উপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে। তাই ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ভূমি বিন্যাস : আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। স্বল্প আয়তনের এই দেশে বসবাস করছে প্রায় ১৫.৮৯ কোটি মানুষ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন (মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বিবিএস)। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভূমির ব্যবহার মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের ধরণ : মানুষের জীবনপ্রণালির সাথে ভূমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমি ছাড়া ফসল উৎপাদন, কল-কারখানা স্থাপন, ঘরবাড়ি নির্মাণ কোনো কিছুই সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়। যথা- গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার এবং শহুরে বা নগর ভূমি ব্যবহার। সারণি ৪.৩.১ এ গ্রামীণ ও নগর ভূমির পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ৪.৩.১ : বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর ভূমির পরিমাণ

ভূমির ধরণ	ভূমির পরিমাণ (ব.কি.মি)	শতকরা হার (%)
গ্রামীণ ভূমি	১,৩২,৮১৩	৯০.০০
নগর ভূমি	১৪,৭৫৭	১০.০০
মোট	১,৪৭,৫৭০	১০০.০০

উৎস : মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ (বিবিএস)

গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের মোট ভূমির ৯০% গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের প্রধানক্ষেত্র কৃষি ও বসতবাড়ি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের ধরণেও বৈচিত্র্য এসেছে। নিম্নে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের ধরণ বর্ণনা করা হলো।

১. কৃষি : বাংলাদেশের মোট ভূমির অধিকাংশই কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত ভূমি মূলত গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। যা গ্রামীণ মানুষের জীবিকার প্রধান মাধ্যম। কৃষিজাত শস্যসমূহের মধ্যে ধান, গম, পাট, ইক্ষু, আলু, সরিষা, ভুট্টা, বিভিন্ন ধরনের সবজি অন্যতম। এখনো বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি ও কৃষি উৎপাদিত ফসল।

২. বসতবাড়ি : গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য খোলামেলা বসতবাড়ি। বেশিরভাগ গ্রামীণ বসতবাড়ির মধ্যখানে উঠান, বহিরাঙ্গণ, চতুর্দিকে গাছ-গাছালি থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ বসতবাড়ির ধরণে পরিবর্তন দেখা

যাচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে যা গ্রামীণ ভূমির চিরাচরিত ব্যবহারের পরিবর্তন নির্দেশ করে। যৌথ পরিবারের ভাঙনের ফলে অধিক বসতবাড়ি নির্মিত হচ্ছে এবং বসতবাড়ির আকার ছোট হচ্ছে। নতুন নতুন বসতবাড়ি নির্মাণের ফলে কৃষি জমির উপর চাপ পড়ছে।

৩. কৃষি খামার : বাংলাদেশের গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারে কৃষি খামারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ এলাকায় জমি ক্রয় বা লিজ নিয়ে কৃষি খামার গড়ে তুলছে। এসব খামারের মধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য খামার, গরু মহিষ বা ছাগলের খামার, ফলের বাগান, কৃষি ফসল উৎপাদন অন্যতম।

৪. বনভূমি : গ্রামীণ ভূমির একটি অংশ বাগান বা বনভূমির জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব বাগান বা বনভূমি বড় না হলেও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। এতে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ, বাঁশ ইত্যাদি থাকে।

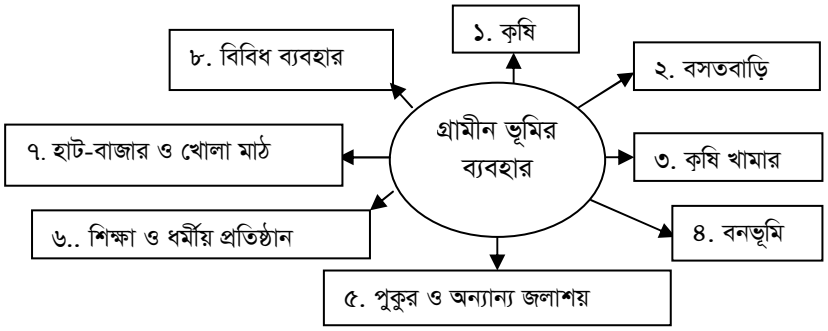

৫. পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় : অবস্থাপন্ন প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পুকুর। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় হাওড়, বাওড়, খাল, ডোবাসহ বিভিন্ন জলাভূমি দেখা যায়। এসব জলাশয় দেশের মৎস্যের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : প্রায় প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণত খোলামেলা পরিবেশে নির্মাণ করা হয়। প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ দেখা যায়, যা গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৭. হাট-বাজার ও খোলা মাঠ : গ্রামীণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হাট-বাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ হাট-বাজারে কৃষক তাদের উৎপাদিত বাড়তি পণ্য বিক্রয় এবং প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে থাকে। খোলা মাঠে সাধারণত মেলা, খেলাধূলা, গরু-ছাগল চারণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

৮. বিবিধ ব্যবহার : রাস্তাঘাট, ফল-ফুলের বাগান, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিসসহ বহুবিধ কাজে গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার করা হয়।

শহুরে বা নগর ভূমি ব্যবহার

বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে নগর এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এতে নগর ভূমির চাহিদা এবং ব্যবহার উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি নগর এলাকায় ভূমির বহুমুখী ব্যবহার থাকায় নগর ভূমির ধারণ ক্ষমতার উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। নগর ভূমির প্রধান ব্যবহারসমূহ নিম্নে দেখানো হলো:

১. আবাসিক এলাকা : নগর ভূমির একটি বৃহৎ অংশ আবাসিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নগর এলাকায় অভিজাত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ভিন্ন ধরনের আবাসিক এলাকা গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন-আমরা যদি রাজধানী ঢাকার আবাসিক ভূমি ব্যবহার লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, উত্তরা, বসুন্ধরা, বারিধারা অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত। আবার নিম্নআয়ের মানুষ কারওয়ান বাজার, মগবাজার প্রভৃতি এলাকার রেললাইনের ধারে বা কোনো সরকারি খাস জমিতে ঘিঞ্জি পরিবেশে বস্তি এলাকায় মানবেতর জীবনযাপন করে। এছাড়া প্রায় গোটা ঢাকা শহরেই বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের জন্য আবাসিক ভবন গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিত ভবনের পাশাপাশি অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র বহু ভবন গড়ে উঠছে। এতে জনজীবন ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দেশের অন্যান্য বিভাগীয় এবং জেলা শহরগুলোতেও বহুতল ভবন নির্মাণ সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

২. বাণিজ্যিক এলাকা : নগর এলাকার অন্যতম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য। নগরীয় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেশাদারী চাকুরি, পণ্যের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র অন্যতম। নগর এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় প্রকার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অসংখ্য মানুষ সম্পৃক্ত থাকে।

৩. শিল্প এলাকা : নগর ভূমির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিল্পের অবস্থান। নগর এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের আধিক্য থাকায় ভূমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। যেমন- ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, গাজীপুরের টঙ্গী শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, নগর এলাকার বাইরেও বিস্তৃত শিল্প এলাকা গড়ে উঠছে। এছাড়া সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলছে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সাধারণত নগর এলাকায় অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে। জনসংখ্যার আধিক্য এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকায় নগরীয় এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি ব্যবহার করা হয়।

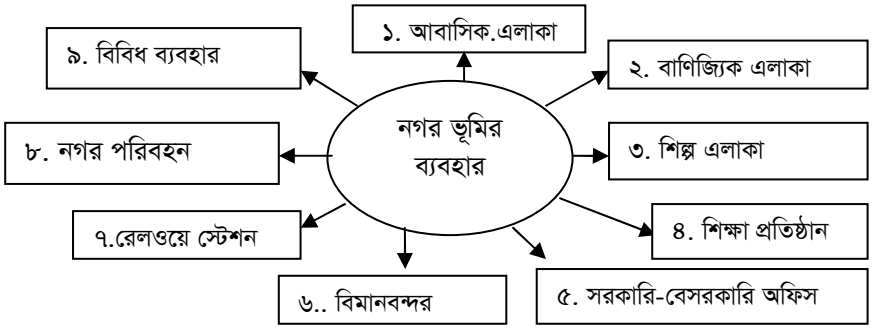

৫. সরকারি-বেসরকারি অফিস : সাধারণত নগর এলাকায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিস থাকে। অন্যান্য শহরের তুলনায় রাজধানী ঢাকায় অফিস-আদালতের সংখ্যা অনেক বেশি।

৬. বিমানবন্দর : বড় বড় নগরগুলোতে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে থাকে বিমানবন্দর। বিমানবন্দর কেন্দ্রিক বিভিন্ন স্থাপনাও নগর ভূমির অন্যতম ব্যবহার।

৭. রেলওয়ে স্টেশন : বিভিন্ন নগর এলাকায় রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করা হয়। ফলে নগর ভূমির একটি অংশ স্টেশন কেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

৮. নগর পরিবহন এলাকা : একটি পরিকল্পিত নগরের জন্য পর্যাপ্ত নগর পরিবহণ আবশ্যক। নগর এলাকায় পরিবহন ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো সড়কপথ। এছাড়া রয়েছে রেলপথ, বিমানপথ এবং নৌপথ। নগর এলাকায় অধিক জনসংখ্যা থাকায় নগর ভূমির একটি বড় অংশ পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে আমাদের দেশে নগর পরিবহনে চাহিদার তুলনায় ভূমির পরিমাণ অনেক কম। ফলে বড় বড় নগরগুলোতে যানজট লেগেই থাকে।

৯. বিবিধ ব্যবহার : নগর ভূমির বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- বিনোদন এলাকা, পার্ক, জাদুঘর, খেলার মাঠ, খোলা মাঠ, সেনানিবাস, নদীবন্দর প্রভৃতি।

ভূমি ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব : বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় স্বল্প ভূমিকে বহুমুখী ব্যবহার করতে হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, পরিবহনসহ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে বনভূমি, জলাভূমি, কৃষিভূমি প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমে যাচ্ছে কৃষিভূমি, বনভূমি, খাল-বিল, নদী এলাকা, খোলা মাঠের পরিমাণ। এছাড়া অধিক জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করতে হয়। এতে করে ভূমির ধারণ ক্ষমতার উপর চাপ পড়ে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবারের জমির বিভক্তি বাড়ছে। এতে ভূমিতে ছোট ছোট আইল দেওয়ার কারণে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় ভূমির ধারণ ক্ষমতার উপর চাপ পড়ছে। এতে করে ভূমির টেকসই বহন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার গুরুত্ব : অর্থনৈতিক এবং স্থানিক দিক বিবেচনায় ভূমি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। ভূমির সর্বোচ্চ টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, কর্মসংস্থান, বিনোদন, শিক্ষা, যাতায়াত, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাগুলো ভূমি ব্যবহারের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। অপরিকল্পিতভাবে জলাভূমি ভরাট বা বনভূমি উজাড় করলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। গ্রামীণ এবং শহুরে বা নগর ভূমি ব্যবহারের সঠিক এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার বন্ধ, পরিকল্পিত নগরায়ন, বনভূমি ও জলাভূমি সংরক্ষণ, বসতবাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার ভূমির ব্যবহার উল্লেখপূর্বক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় একই ভূমির বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায়। এদেশের ভূমি ব্যবহারকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার এবং শহুরে বা নগর ভূমির ব্যবহার। গ্রামীণ ভূমি ব্যবহারের প্রধান বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ভূমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় যা দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণসহ কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। এছাড়া বসতবাড়ি, কৃষিভিত্তিক খামার, বনভূমি, জলাভূমি, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, নগর ভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আবাসিক এলাকা, শিল্প ও বাণিজ্য এলাকা, সরকারি-বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়। গ্রামীণ ও নগর ভূমির বহুবিধ ব্যবহার থাকায় এর সঠিক পরিকল্পনা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ভূমির সাথে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রভৃতি মৌলিক চাহিদাসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ভূমির সঠিক এবং সর্বোত্তম ব্যবহারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে গ্রামীণ ভূমির পরিমাণ শতকরা কত ভাগ?

(ক) ৭৫% (খ) ৮০%

(গ) ৮৫% (ঘ) ৯০%

২। ভূমি হলো-

i. প্রাকৃতিক সম্পদ ii. অপ্রাকৃতিক সম্পদ iii. কৃত্রিম সম্পদ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। গ্রামীণ ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় কোন খাতে?

(ক) বসতবাড়ি (খ) পুকুর

(গ) কৃষি (ঘ) শিল্প-কারখানা

৪। নগর ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো-

i. আবাসিক ব্যবহার

ii. শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র

iii. সরকারি-বেসরকারি অফিস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ বাংলাদেশের জলবায়ু
Climate of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের জলবায়ুর ঋতুভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন ঋতুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শীতকাল ।

জলবায়ু

জলবায়ু বলতে কোনো দেশ বা বৃহৎ অঞ্চলের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় অবস্থাকে বুঝায়। আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির দৈনন্দিন গড় অবস্থা। সুতরাং বলা যায় যে, আবহাওয়া হলো কোনো একটি ক্ষুদ্র এলাকার বায়ুমণ্ডলের ক্ষণস্থায়ী অবস্থা এবং জলবায়ু কোনো দেশ বা বৃহৎ অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের দীর্ঘকালীন অবস্থা।

বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate of Bangladesh) : বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র এবং সমভাবাপন্ন। দেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এবং মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব অধিক থাকায় সামগ্রিকভাবে এদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়। এখানকার জলবায়ুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মৌসুমী বায়ু। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার এবং গড় তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াস। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুপ্রবাহের উপর ভিত্তি করে তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতু দেখা যায়। এগুলো হলো- গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল এবং শীতকাল।

১. গ্রীষ্মকাল (Summer Season) : বাংলাদেশের উষ্ণতম ঋতু গ্রীষ্মকাল। মার্চ থেকে মে (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল ধরা হয়। এ সময় সূর্যের উত্তরায়নের ফলে উত্তাপের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপসাগর থাকায় এ সময় তাপমাত্রা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে,

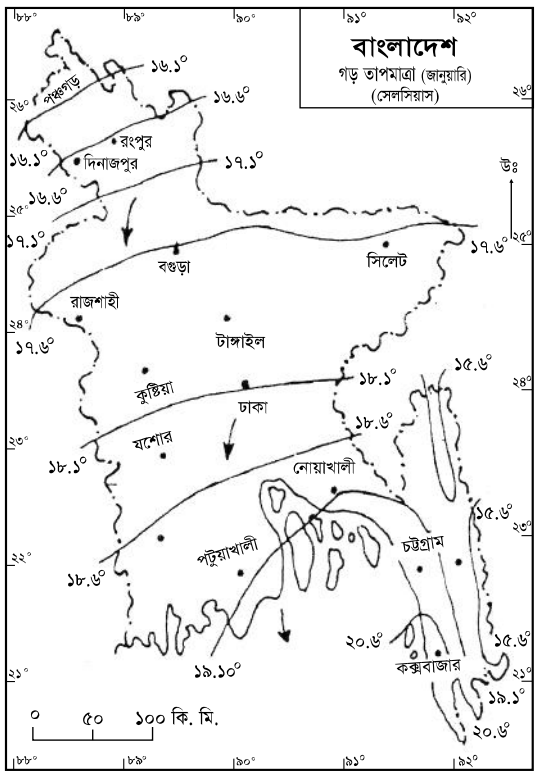

চিত্র-৪.৪.১: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

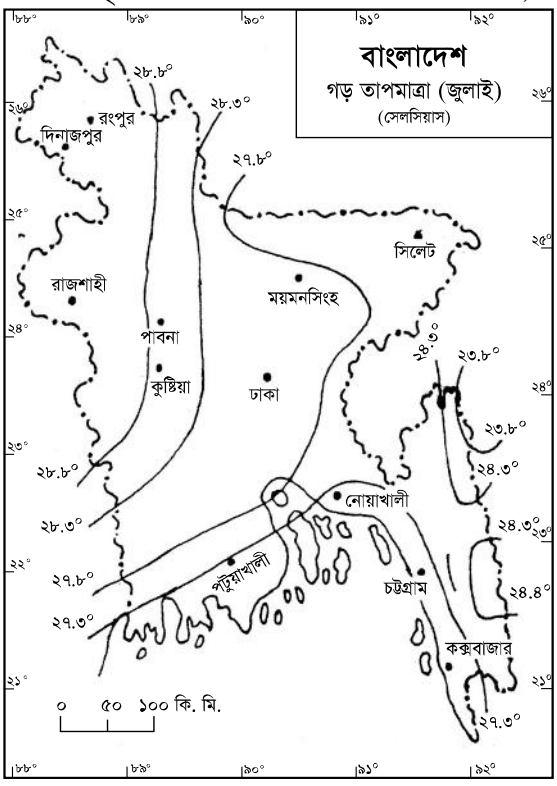

চিত্র-৪.৪.২: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

এপ্রিল মাসে যখন কক্সবাজারে তাপমাত্রা ২৭.৬৪° সেলসিয়াস তখন রাজশাহীতে তাপমাত্রা প্রায় ৩০° সেলসিয়াস। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১° সেলসিয়াস। এপ্রিল মাসে গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৮° সেলসিয়াস এবং এটি বছরের উষ্ণতম মাস। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কালবৈশাখী ঝড়। এসময় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সংঘটিত হয় এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫১ সেন্টিমিটার। এ ঋতুতে বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উত্তাপের ফলে উপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে বজ্রসহ ঝড়-বৃষ্টি হয় যা কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

২. বর্ষাকাল (Rainy Season) : বাংলাদেশে জুন হতে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়ী হয়। এ সময় সূর্য বাংলাদেশের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার কথা থাকলেও সারাদেশে কম-বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় খুব বেশি তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। এ ঋতুতে গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস। তবে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে তুলনামূলক বেশি তাপমাত্রা থাকে। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প ধারণ করে। যা ঘনীভূত হয়ে শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ ঋতুতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে। বর্ষা ঋতুতে উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু অন্তর্হিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্রানুসারে উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে পরিণত হয়। এ ঋতুর শেষ দিকে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে দেখা যায়।

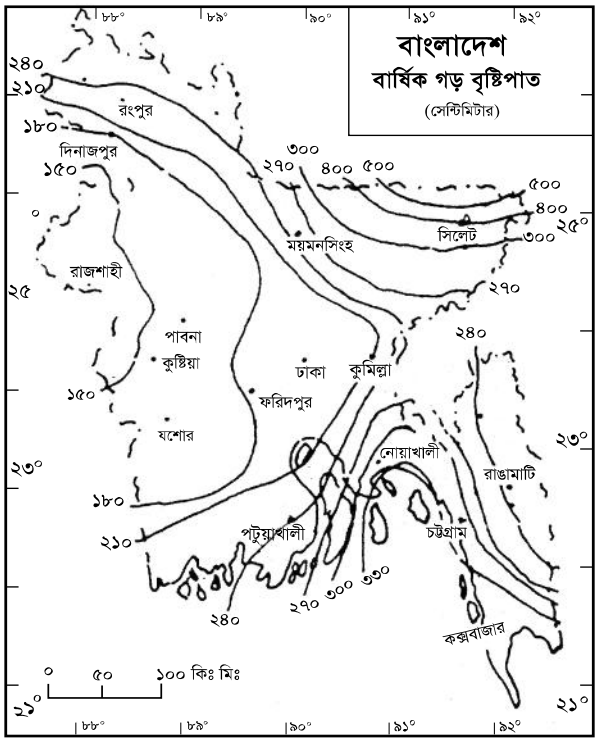

চিত্র-৪.৪.৩: বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

৩. শীতকাল (Winter Season) : সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি (কার্তিক-ফাল্গুন) মাস পর্যন্ত শীতকাল ধরা হয়। এ সময় সারা দেশে তাপমাত্রা কমতে থাকে। এ ঋতুটি ঠান্ডার সময় হিসেবে পরিচিত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘন কুয়াশা দেখা যায়। অনেক সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যায় না। শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারি শীতলতম মাস। এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। সাধারণত উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এ ঋতুতে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এ সময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ হয়ে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সময় তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এদেশের জলবায়ুতে প্রায়শ কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। যেমন-অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীতের স্থায়িত্বে ভিন্নতা, তাপদাহ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ঋতুসমূহের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

ঋতুর নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	তাপমাত্রা	বায়ুপ্রবাহ
গ্রীষ্মকাল			
বর্ষাকাল			
শীতকাল			

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুপ্রবাহে দিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে এদেশের জলবায়ুকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল এবং শীতকাল। এখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, বৃষ্টিবহুল বর্ষাকাল এবং শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় এক পঞ্চমাংশ হয়ে থাকে। বর্ষাকালে প্রায় পাঁচ ভাগের চারভাগ বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন হলেও পাহাড়ি ও উপকূলীয় এলাকায় সামান্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়। তিন ঋতুর কোনো সময়ই তাপমাত্রা চরমভাবাপন্ন হয় না। এপ্রিল উষ্ণতম এবং জানুয়ারি শীতলতম মাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের জলবায়ুতে কয়টি ঋতু দেখা যায়?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২,৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কয়েকদিন ধরে হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সাথে ঘন কুয়াশায় সূর্যের দেখা নেই। ঘন কুয়াশা এবং হিমেল হাওয়ায় এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিশু ও বৃদ্ধ মানুষেরা ঠান্ডায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋতুটির নাম কী?

(ক) গ্রীষ্মকাল (খ) বর্ষাকাল
(গ) শীতকাল (ঘ) কোনটিই নয়

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঋতুটির বৈশিষ্ট্য-

i. তীব্র শীত ii. হিমেল হাওয়া
iii. প্রচুর বৃষ্টিপাত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?

(ক) জানুয়ারি (খ) এপ্রিল
(গ) জুন (ঘ) সেপ্টেম্বর

৫। বর্ষাকালে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের কত শতাংশ সংঘটিত হয়?

(ক) প্রায় ৭০ শতাংশ (খ) প্রায় ৭৫ শতাংশ
(গ) প্রায় ৮০ শতাংশ (ঘ) প্রায় ৮৫ শতাংশ

পাঠ-৪.৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
Natural Disaster

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, খরা, আর্সেনিক, ভূমিকম্প, সুনামি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্যোগকে বুঝায়। এ সকল দুর্যোগ সংঘটনের পিছনে মানুষের কোনো অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ থাকেনা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রার উপর নির্ভর করে জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণর। বিশ্বের সকল দেশে বা অঞ্চলে দুর্যোগের মাত্রা এবং ধরণ একই রকম নয়।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি কারণে প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন, ক্ষয়ক্ষতি হয় সম্পদ ও জীবনের। বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী ও টর্নেডো, বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, খরা, আর্সেনিক, ভূমিকম্প ও সুনামি অন্যতম। নিম্নে এসব দুর্যোগ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো-

ক. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস (Cyclone and Tidal Surge) : বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির একটি আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়সমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি মারাত্মক ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে। সাধারণত এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠে সাধারণত ২৭° সেলসিয়াস বা এর বেশি তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে উচ্চচাপ বিরাজ করে। এসময় উচ্চচাপযুক্ত বায়ু প্রবলবেগে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রভাগে যেখানে নিম্নচাপ থাকে সেদিকে ধাবিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠে উৎপত্তি লাভ করে মহাদেশীয় মূলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলকে চোখ বলে। এটি দেখতে অনেকটা মানুষের চোখের মতো। বিগত অর্ধশতাব্দীতে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে। এর মধ্যে ১৯৭০, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০৭, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় অন্যতম। জীবনহানির দিকে থেকে সবচেয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ১৯৭০, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালে সংঘটিত হয় (সারণি ৪.৫.১)। ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় জেলাসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এসব জেলার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা প্রভৃতি।

সারণি ৪.৫.১ : বাংলাদেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়সমূহ

সংঘটিত হওয়ার সাল	প্রাণহাণির সংখ্যা
১২ নভেম্বর. ১৯৭০	প্রায় ৫,০০,০০০ জন
২৯ নভেম্বর, ১৯৮৮	প্রায় ১,০৮,০০০ জন
২৯ এপ্রিল, ১৯৯১	প্রায় ৫,৭০৮ জন
১৫ নভেম্বর, ২০০৭	প্রায় ৩,৪৪৭ জন
২৫ মে, ২০০৯	প্রায় ৩৩০ জন

ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত জলোচ্ছ্বাস। ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তির পর যখন প্রবলবেগে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয় তখন সমুদ্রের জলরাশি ফুলে ওঠে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মূল ভূ-খণ্ডে আঘাত হানে। এরূপ উঁচু জলরাশিকে জলোচ্ছ্বাস

বলে। এসময় জলরাশির উচ্চতা ১৫-৪০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সময় যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা থাকে তাহলে পানি আরো বেশি ফুলে ওঠে এবং জলোচ্ছ্বাস ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ভোলায় প্রায় ৪০ ফুট, ২০০৭ সালে পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলে প্রায় ২০-২৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড় ছাড়াও ভূমিকম্পের ফলেও জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসকে সুনামি বলে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষসহ জীবজন্তু ও সহায় সম্পদ পানিতে ভেসে চলে যায় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমুদ্রের সাথে মিশে যায়। যেমন-১৯৯১ সালে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে পরবর্তীতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ২০০৭ এবং ২০০৯ সালে যথাক্রমে সিডর ও আইলায় জীবনহানির পরিমাণ সহনীয় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. কালবৈশাখী ঝড় ও টর্নেডো (Nor' wester & Tornado) : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় এবং টর্নেডো অন্যতম। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণত বৈশাখ মাসের শেষের দিকে এ ঝড় হতে দেখা যায় বলে একে কালবৈশাখী ঝড় বলে। মার্চ-এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার দিকে আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। এ ঝড়ই কালবৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। এ ঝড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সংঘটিত হয়। অনেক সময় বৃষ্টিপাতের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। দেশের পূর্বাঞ্চলে এ ঝড় অধিক হয়ে থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ে মানুষ, পশুপাখি ও সম্পদহানি ঘটে এবং কাঁচা ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। এছাড়া ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় টর্নেডোর ক্ষেত্রেও প্রচণ্ডবেগে বাতাস ঘুরতে ঘুরতে প্রবাহিত হয়। কোনো স্থানে নিম্নচাপ বা লঘুচাপ সৃষ্টি হলে উক্ত স্থানের উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায় এবং ঐ শূন্য জায়গা পূরণের জন্য চতুর্দিকের শীতল বায়ু দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় এবং টর্নেডোর উৎপত্তি হয়। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে টর্নেডো আঘাত হানে। ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় প্রলয়ংকরী টর্নেডো আঘাত হানে এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। টর্নেডোর ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ সাধারণত ঘণ্টায় ৪৮০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার হতে পারে। টর্নেডোর বিস্তার মাত্র কয়েক মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর টর্নেডো হতে দেখা যায়। টর্নেডো এবং ঘূর্ণিঝড়ের মূল পার্থক্য হলো ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তি হয় সমুদ্রে, অন্যদিকে টর্নেডো যে কোনো স্থানে সৃষ্টি হতে পারে।

গ. বন্যা (Flood) : বন্যা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাধারণ অর্থে নদীর পানি যখন দু'কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম, নগর, বন্দর, বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল বিনষ্ট করে তখন তাকে বন্যা বলে। প্রায় প্রতি বছর দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়। ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বন্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-মৌসুমী বন্যা, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা এবং নগর বন্যা।

১. মৌসুমী বন্যা : বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তাকে মৌসুমী বন্যা বলে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে মৌসুমী বন্যা তেমন ক্ষতি করে না তবে কখনো কখনো মারাত্মক ক্ষতিকর রূপ ধারণ করে। মৌসুমী বন্যার মাত্রা স্বভাবিক হলে ফসল উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

২. আকস্মিক বন্যা: বর্ষা মৌসুম ব্যতীত অন্য যে কোনো মৌসুমে আকস্মিক বৃষ্টিপাতের ফলে বা পাহাড়ি ঢলে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তাকে আকস্মিক বন্যা বলে। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রায় প্রতি বছর আকস্মিক বন্যা হতে দেখা যায়।

৩. উপকূলীয় বন্যা : উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি বা জোয়ার-ভাটাজনিত কারণে যে বন্যা সৃষ্টি হয় তাকে উপকূলীয় বন্যা বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসমূহে এ ধরনের বন্যা দেখা দেয়।

৪. নগর বন্যা : নগর এলাকায় সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে বন্যা দেখা দেয়। এ ধরনের বন্যাকে নগর বন্যা বলে। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় শহরে এ ধরনের বন্যা দেখা যায়।

বন্যার কারণ : প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় প্রকার কারণেই বন্যা সৃষ্টি হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে- ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিরূপের গঠন ও প্রকৃতি, অতিবৃষ্টি, বরফগলা পানি, আকাঁবাঁকা নদী, নিম্নচাপ, নদীর অতিরিক্ত

পানি, নদীর পানি প্রবাহ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ইত্যাদি। বন্যার মানবসৃষ্ট কারণগুলো হলো-নদীর গতিপথে বাঁধা, খাল ও নালা ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদীর তলদেশ ভরাট, বনজসম্পদ ধ্বংস করা, নদীশাসন, উজানে পানি প্রত্যাহার বা বাঁধ নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

বন্যার প্রভাব : বন্যার ফলে বহুমুখী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন-সম্পদহানি, ফসল উৎপাদন হ্রাস, উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিজমি লবণাক্ত হওয়া, রোগ-ব্যাধির বিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়া, সুপেয় পানির সংকট, খাদ্য ও পুষ্টির অভাব প্রভৃতি। বিগত অর্ধশতাব্দীর কিছু বেশি সময়ে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৫৪, ১৯৬৩, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭ সালের বন্যা। ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং দেশের অধিকাংশ জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঘ. নদীভাঙন (Riverbank Erosion) : সাধারণভাবে নদীর পানি প্রবাহের ফলে নদীর তীর বা পাড়ের ভাঙনকে নদীভাঙন বলে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাঙন দেখা দেয়। সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তাসহ অসংখ্য শাখা ও উপনদী দ্বারা দেশের প্রায় ১০০টি উপজেলা কমবেশি ভাঙনের শিকার হয়। নদীভাঙনপ্রবণ জেলাসমূহের মধ্যে জামালপুর, কুড়িগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া, মাদারীপুর, নারায়নগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, শরীয়তপুর, শেরপুর, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, বরিশাল, গোপালগঞ্জ এবং উপকূলীয় অঞ্চল অন্যতম।

নদীভাঙনের কারণ : নদীভাঙন সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণও দায়ী। নিম্নে নদীভাঙনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হওয়া;
২. নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করা;
৩. নদীর গতিপথ অধিক আঁকাবাঁকা হওয়া;
৪. পলি জমা হয়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া;
৫. বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া;
৬. নদীগর্ভে নরম ও ক্ষয়িষ্ণু শিলার উপস্থিতি;
৭. নদীগর্ভে ফাটলের উপস্থিতি;
৮. পার্বত্য এলাকায় বরফ গলনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া;
৯. নদী তীরের গাছপালা নিধন করা;
১০. নদী তীর এবং তলদেশ থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন;
১১. নদী তীর দখল করে নদীর গতিপথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা;
১২. নিয়মিত নদী খনন না করা;
১৩. অপরিকল্পিত ও অধিক পরিমাণে নৌযান চালানো ইত্যাদি।

নদীভাঙনের প্রভাব : নদীভাঙনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে অসংখ্য লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুহারা এবং ভূমিহীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙনের অন্যান্য প্রভাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্রতা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, পুষ্টিহীনতা, শহরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, রোগব্যাধির বিস্তার ইত্যাদি। এছাড়া সামাজিক বন্ধনেও ভাঙন দেখা দেয়। অনেক সময় জমিজমা ও সহায় সম্পদ হারিয়ে মানুষ উদ্বাস্তু হওয়ায় শহরে গমন করে এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কে টান পড়ে।

ঙ. লবণাক্ততা (Salinity) : লবণাক্ততা বলতে মাটি ও পানিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বুঝায়। সাধারণত লবণাক্ততার মাত্রা পরিমাপ করা হয় পিপিটি (Parts Per Thousand-PPT) দ্বারা। সমুদ্রের পানিতে লবণাক্ততার গড় মাত্রা ৩৫ পিপিটি অর্থাৎ ১ কিলোগ্রাম পানিতে প্রায় ৩৫ গ্রাম লবণ থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি। বঙ্গোপসাগরের পানি জোয়ারের সময় নদীর মাধ্যমে উপকূলীয়

অঞ্চলের ভূমিতে প্রবেশ করে লবণাক্ততা সৃষ্টি করে। সাধারণত আগস্ট মাস থেকে লবণাক্ততা শুরু হয় এবং ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। উপকূলীয় ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় লবণাক্ততা দেখা যায়। এর মধ্যে সর্বাধিক লবণাক্ততায় আক্রান্ত খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা জেলা। এছাড়া বরিশাল, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, মাগুরা, কক্সবাজার, ফেনী প্রভৃতি জেলা লবণাক্ততায় আক্রান্ত।

লবণাক্ততার কারণ : সাধারণত উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি ও পানিতে লবণাক্ততার প্রধান কারণ জোয়ার-ভাটা ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে দায়ী করা হয়।

লবণাক্ততার প্রভাব : লবণাক্ততার ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-

১. উপকূলীয় অঞ্চলের জমি কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া;
২. সুপেয় পানির অভাব দেখা দেওয়া;
৩. উদ্বাস্তু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি,
৪. সম্পদহানি ঘটে দারিদ্রতা বৃদ্ধি;
৫. রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব;
৬. ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব;
৭. মিঠা পানির মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া;
৮. গাছপালায় মড়ক লাগা;
৯. ফসলের গোড়া পচে যাওয়া প্রভৃতি।

চ. খরা (Drought) : সাধারণত খরা বলতে কোনো এলাকায় দীর্ঘসময় ধরে ভূমিতে পানির অনুপস্থিতিকে বুঝায়। অর্থাৎ কোনো এলাকা বৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকলে বা অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা কমে গিয়ে শুষ্ক হয়ে পড়ে। এর ফলে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং পানির স্তর নিচে নেমে যায়। এরূপ অবস্থাকে খরা বলে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে খরার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। বিগত অর্ধ শতকে ১৯৭৩, ১৯৭৫, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০১৬ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক খরা দেখা দেয়।

খরার কারণ : খরার উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো–

১. বৃষ্টিপাতের অভাব;
২. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা;
৩. বনভূমি উজাড়;
৪. নদীর উজানে অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ;
৫. এল নিনো ও লা নিনোর প্রভাব প্রভৃতি।

খরার প্রভাব : খরার ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো-

১. কৃষি ফসলের উৎপাদন হ্রাস;
২. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া;
৩. ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গমন;
৪. উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্ন হওয়া;
৫. খাদ্য ও পুষ্টির সংকট তৈরি হওয়া;
৬. গ্রামীণ দারিদ্রতা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি;
৭. মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস প্রভৃতি।

ছ. আর্সেনিক (Arsenic) : আর্সেনিক একটি বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। এটি এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বাংলাদেশে আর্সেনিক নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৪ সালে। এক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের ৪১টি জেলার নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অধিক

আর্সেনিক রয়েছে (গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০১ পিপিএম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। আর্সেনিক মিশ্রিত পানি পান করলে আর্সেনিকোসিস নামক রোগ হয়। আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাসমূহের মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, যশোর, মাগুরা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, পাবনা অন্যতম।

আর্সেনিক দূষণের প্রভাব : আর্সেনিক দূষণের ফলে যেসব প্রভাব পড়ে সেগুলো হলো-

১. মানব দেহ চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়া;
২. জিহ্বা, হাত ও পায়ের তালুতে কালো দাগ পড়া;
৩. বমি, অরুচি, রক্ত আমাশয়, মুখে ঘা দেখা দেয়া;
৪. ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রনালী, মূত্রথলী ও বৃক্কে ক্ষত তৈরি;
৫. রক্তশূণ্যতা, শ্বসন যন্ত্র আক্রান্ত হওয়া;
৬. প্রজনন স্বাস্থ্যে প্রভাব;
৭. স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া;
৮. শরীরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন প্রভৃতি ।

জ. ভূমিকম্প (Earthquake) : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-গাঠনিক কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এদেশ। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশকে তিনটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো-

১. মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল (রিখটার স্কেলে মাত্রা ৭);
২. মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল (রিখটার স্কেলে মাত্রা ৬) এবং
৩. কম ঝূঁকিপূর্ণ অঞ্চল (রিখটার স্কেলে মাত্রা ৫)।

ভূমিকম্পের কারণ : যেসব কারণে ভূমিকম্প হতে পারে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. ভূ-ত্বকের প্লেটসমূহ পরস্পর ধাক্কা খেলে;
২. ভূ-অভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি ঘটলে;
৩. ভূ-অভ্যন্তরে তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে;
৪. ভূ-গর্ভে সঞ্চিত বাষ্পচাপ অধিক হওয়ার ফলে নিম্নভাগে প্রবলবেগে ধাক্কা দিলে;
৫. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে;
৬. বড় ধরনের শিলাচ্যুতি ঘটলে;
৭. হিমানী সম্প্রপাত হলে তুষারখণ্ডের আঘাতে;
৮. ভূ-ত্বকের পানি ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে;
৯. ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল সংঘর্ষের ফলে কতক অংশ ধসে পড়লে ;
১০. খনি হঠাৎ ধ্বসে পড়লে প্রভৃতি।

ভূমিকম্পের প্রভাব : ভূমিকম্পের ফলে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো-

১. ভূমিকম্পের মাত্রা অধিক হলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে থাকে;
২. জীবজন্তু ও গাছপালা ধ্বংস হতে পারে;
৩. ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, কল-কারখানা ধ্বংস হতে পারে;
৪. ভূ-ত্বকে ভাঁজের সৃষ্টি হওয়া;
৫. নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া;
৬. ভূ-ত্বকে ফাঁটল ও চ্যুতির সৃষ্টি;
৭. সমুদ্রতলের পরিবর্তন হওয়া;
৮. ভূমির উত্থান ও পতন হওয়া;
৯. হিমানী সম্প্রপাত;
১০. জনজীবনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়া;
১১. বহু মানুষ শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত হয় যা জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এসব দুর্যোগ মোকাবেলা করে এদেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আমাদের প্রিয় এই দেশ প্রায় প্রতি বছরই একাধিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, কালবৈশাখী ঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙন অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এছাড়া রয়েছে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঝুঁকি। এসব দুর্যোগ মানুষের জীবন ও সম্পদহানির পাশাপাশি স্বাভাবিক পরিবেশকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে তা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘসময় লেগে যায়, ব্যাহত হয় দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ-

i. বন্যা

ii. ঘূর্ণিঝড়

iii. নদীভাঙন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সিডর কোন সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ২০০৭ (খ) ২০০৮

(গ) ২০০৯ (ঘ) ২০১০

৩। দীর্ঘ সময় ধরে পানির অনুপস্থিতিকে কী বলে?

(ক) বন্যা (খ) খরা

(গ) টর্নেডো (ঘ) কোনটিই নয়

৪। আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?

(ক) ০.০১ পিপিএম (খ) ০.০৫ পিপিএম

(গ) ০.০৭ পিপিএম (ঘ) ১.০০ পিপিএম

৫। সাধারণত কোন সময়ে টর্নেডো হয়?

(ক) নভেম্বর-ডিসেম্বর (খ) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

(গ) মার্চ-এপ্রিল (ঘ) মে-জুন

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। গ ৫। ক ৬। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ক ৫। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৫ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্ন

১) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিরাজ করে। ফলে অন্যান্য সময়ের তুলনায় তাপমাত্রা বেশি থাকে। অনেক সময় কয়েকদিন ধরে তীব্র তাপদাহে মানুষ ও প্রাণির জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। মাঠঘাট, কৃষিজমি ফেটে চৌচির অবস্থা হয়। আকাশে মেঘের দেখা পাওয়া যায় না। তবে শীতকালে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে হিমেল হাওয়ায় শরীর হিম হয়ে আসে।

(ক) মার্চ থেকে মে মাস কোন ঋতুর অন্তর্ভুক্ত? ১

(খ) কালবৈশাখী ঝড় কোন সময় আঘাত হানে এবং কেন? ২

(গ) উদ্দীপকে আলোচ্য উষ্ণ ঋতুতে স্থানভেদে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় কেন? ৩

(ঘ) শীতকালে উত্তরাঞ্চলে তীব্র ঠাণ্ডার কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৪

২) নিচের ছবিটি দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

(ক) উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কী নির্দেশ করছে? ১

(খ) বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের নাম লিখুন। ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় মানবজীবনে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৪